

মুঘল প্রাদেশিক ও গ্রামীণ প্রশাসন : তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

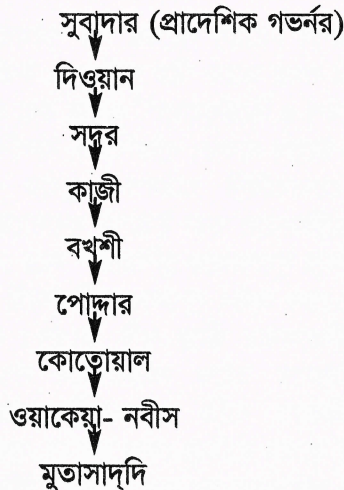
ডঃ মোঃ মহিবুল ইসলাম *

মোঃ শরিফুল ইসলাম **

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুঘল শাসনামল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশেষত ষোড়শ শতকের প্রারম্ভের দিকে ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এজন্য ভারতে মুঘল শাসন ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং ভারসাম্যপূর্ণ শাসন বলা হয়ে থাকে। সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে জনগণের কল্যাণ সাধন, গণ অসন্তোষ প্রতিরোধ ও শাসন কাঠামোকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা মুঘল সম্রাটদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সম্রাট বা বাদশাহ ছিলেন মুঘল শাসন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের মত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার একার পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। তাই প্রশাসনিক সুবিধার্থে মুঘল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসনের পাশাপাশি প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য মুঘল সাম্রাজ্যকে কতকগুলি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। সুবাগুলির আয়তন ও সংখ্যা সবসময় একরকম ছিল না। সম্রাট আকবরের সময় ভারতে ১৫টি সুবা ছিল^১। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০-এ উন্নীত হয়। সুবাগুলিকে আবার কতকগুলি সরকার বা বিভাগে এবং সরকারগুলিকে মহাল, পরগনা বা জিলায় ভাগ করা হয়। প্রশাসনের ক্ষুদ্রতম একক ছিল মৌজা বা গ্রাম। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের মতে “মুঘল প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো মুঘল কেন্দ্রীয় সরকারের অবিকল ক্ষুদ্র চিত্র ছিল^২। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলির অনুরূপ প্রাদেশিক সরকারের সার্বিক কাজ কর্ম কয়েকটি দপ্তরে বিভক্ত ছিল।

সুবার শাসনকার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে সকল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল, নিম্নে তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো:



* ড. মোঃ মহিবুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

** মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সুবাদার : “সুবাদার” আরবী শব্দ। এর অর্থ তত্ত্বাবধান বা দিকনির্দেশক। মুঘল আমলে যেমন প্রাদেশিক গভর্নরকে সুবাদার বলা হতো তেমনি বাহমানী রাজ্যের প্রাদেশিক গভর্নরকে “তরফদার” বলা হতো^৩। দিল্লীর সুলতানী আমলের গোড়ার দিকে প্রাদেশিক গভর্নরকে “ওয়ালি”^৪ এবং লোদী ও সুরী শাসনামলে তিনি “হাকিম”^৫ নামে পরিচিত ছিলেন। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার অধিকর্তাকে সরকারিভাবে সিপাহসালার উপাধিতে অভিহিত করা হয় এবং তিনি সুবাদার হিসেবে পরিচিত হন। অবশ্য পরে তাঁকে সুবাহ বলা হত^৬। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর গভর্নরের নামের শেষ পরিবর্তন ঘটে এবং তখন হতে তিনি নাজিম নাম গ্রহণ করেন^৭। সাধারণতঃ সম্রাট কর্তৃক অত্যন্ত জ্ঞানী-গুণি, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে প্রদেশের সর্বোচ্চ গভর্নর পদে নিযুক্ত করা হত। কিন্তু কখনো কখনো রাজপরিবারের যুবরাজ ও উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রকে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্নর পদে নিয়োগ করত। তবে এসব ক্ষেত্রে একজন কর্মঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তরুণ গভর্নরের “আতালিক” অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ও শিক্ষকরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তিনিই ছিলেন উপগভর্নর। কোন কোন সময় গভর্নরের চরম ভাবের উচ্ছলতা ও যৌবনের চঞ্চলতার দরুন আতালিক গভর্নরের পক্ষে কাজ করতেন। তরুণ গভর্নরকে সাহায্যকল্পে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা দ্বারা একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হতো^৮। আতালিক উপগভর্নর রূপে স্থায়ী প্রদেশের সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য দায়ী ছিলেন। যে মুহূর্তে আতালিকের অসামর্থের কিংবা ইচ্ছাকৃত কর্তব্যের অবহেলার অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণগোচর হত তাকে বরখাস্ত করা হতো^৯। মুঘল আমলে মাঝে মধ্যে কোন কোন প্রদেশে যুগ্ম গভর্নর নিয়োগেরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনাকল্পে সম্রাট আকবর একত্রিশতম প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তারূপে দু’ব্যক্তিকে যুগ্মগভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। আকবর কর্তৃক নবপদে নিযুক্ত যুগ্মগভর্নরদের একটি তালিকা আবুল ফজল প্রণয়ন করেন^{১০}।

প্রাদেশিক সুবাদারগণ নিয়োগ লাভের পর পদমর্যাদার চিহ্নে^{১১} ভূষিত হন এবং দায়িত্বভার গ্রহণের সময় তাকে স্থায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সরকারি আদেশ ও নির্দেশমালা^{১২} প্রদান করা হত। এই আদেশনামায় স্পষ্টভাবে সুবাদারের ক্ষমতা উল্লেখ থাকত; ন্যায়বিচার, নানাবিধ পূর্তকার্যে আত্মনিয়োগ, শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার, সেনাবাহিনী পরিদর্শন, সুবার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে রাজদরবারকে ওয়াকিফহাল করা ইত্যাদি সুবাদারের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে সরকারি নির্দেশনামায় সুবাদারকে হুশিয়ার^{১৩} করে দেয়া হত যে, তিনি যেন অবাঞ্ছনীয় সঙ্গ হতে দূরে থাকেন অর্থাৎ সুবাদার অমিতব্যয়ী ও হীনকর্মে লিপ্ত না হয়ে সুবার সার্বিক শাসন পরিচালনায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। সুবাদারকে মান্য করা ও সুবার শাসনকার্য পরিচালনায় তাকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য সরকারি নির্দেশমালায় অভিজাত ব্যক্তি ও জায়গীরদারদের প্রতি আদেশ দেয়া হত। সুবাদারকেও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হত যে, সুবার জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বিধান করা তার অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

সুবার শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদ গুলোতে যেমন: উপ-গভর্নর পদে, সুবাদারের সুপারিশক্রমে উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগসহ^{১৪} অন্যান্য নিম্নপদস্থ পদগুলো বিভাগীয় প্রধানদের সুপারিশে পূর্ণ করা হতো। সুবাদারের অধীনস্থ মনসবদারদের সম্পর্কে তাঁর সুপারিশ সম্রাট যথাযথ মর্যাদা দিতেন। সুতরাং সুবাদার জ্ঞানী-গুণি, অভিজ্ঞ, উপযুক্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতির^{১৫} জন্য সম্রাটের নিকট যে সুপারিশ করতেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সুবাদার বিদ্রোহী জমিদার ও আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দানের ব্যবস্থা করতেন। সুবার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণী সুবাদারকে প্রতি মাসে দু'বার কেন্দ্রীয় রাজদরবারে প্রেরণ করা আবশ্যিক ছিল। জলসেচের মাধ্যমে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ ও পরম উন্নতির জন্য, রায়দেরকে উৎসাহিত করাও সুবাদারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খালসা মহলের আয়ের প্রতি সুবাদার অর্থলোলুপ দৃষ্টি দিলে, দিওয়ান-ই-খালসা সম্রাটের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন এ মর্মে সুবাদারকে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হত। শেখ ও কাজীদেবের প্রতি সহদয় ব্যবহার করা এবং ফকির দরবেশদেরকে সাহায্য করা সুবাদারের কর্তব্য ছিল। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ দুর্বল অসহায় গরীবদের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে না পারে সেদিকে সুবাদার কড়া নজর রাখতেন। সুবার এখতিয়ারাধীন সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট হতে বার্ষিক কর আদায় করে কেন্দ্রীয় রাজদরবারে উক্ত রাজস্ব নিরাপদে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা সুবাদারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল^{১৬}।

খ. দিওয়ান: দিওয়ান শব্দটি ফারসী হতে উদ্ভূত। ইহা পারসিকদের একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান ছিল। এ-বিভাগে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হতো^{১৭}। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত ওমর (রাঃ) এর সময় আরব শাসন ব্যবস্থায় অবসর বৃত্তির প্রস্তুতকরণের তালিকা বইকে দিওয়ান বলা হতো^{১৮}। দিল্লীর সুলতানী আমলে ওয়াজীরের অধীনে রাজস্ব ও অর্থদপ্তর দিওয়ান নামে অভিহিত ছিল। মুঘল আমলে দিওয়ান শব্দের ব্যবহার আরও নির্দিষ্ট ছিল এবং দিওয়ান শব্দ দ্বারা অর্থ ও রাজস্ব দপ্তরের প্রধানকে স্পষ্টভাবে বুঝাত^{১৯}। সুবাদারের পর প্রাদেশিক দিওয়ান সুবায় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। দিওয়ানের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করত এবং দিওয়ান কর্মের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী ছিলেন^{২০}। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করতেন। অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি গভর্নরের সমমর্যাদা সম্পন্ন ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তবে প্রদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। এভাবে প্রদেশে দুটি সমান্তরাল ও পারস্পরিক স্বাধীন প্রশাসনিক সংগঠনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়^{২১}। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় সুবাদারের যেমন ফৌজদার হতে শুরু করে নিম্নপদস্থ গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব ছিল, তেমনি প্রদেশের রাজস্ব শাসন ব্যবস্থায় অমাত্যগণ হতে নিম্নপদস্থ পাটোয়ারী পর্যন্ত কর্মচারীদের উপর দিওয়ানের কর্তৃত্ব ছিল। এ পদ্ধতিতে প্রকৃতিগত দিক হতে দ্বৈত প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল^{২২}। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশের তথাকথিত দ্বৈত শাসনের সাথে এর সাদৃশ্য আছে। প্রদেশের

সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের ক্ষমতার উপর বাধা সৃষ্টি এবং তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত দ্বৈত শাসন প্রণালীর উদ্ভব ঘটেছিল। সুবাদার ও দিওয়ান ছিল মূলতঃ আরব শাসন ব্যবস্থায় আমীর ও আমীরের অনুরূপ। তারা উভয়ে পরস্পরের কার্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন^{২৩} এবং একে অন্যের কাজ কর্ম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিবরণী পাঠাতেন^{২৪}। কিন্তু কোন প্রদেশের গভর্নর ও দিওয়ান পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়ে পড়লে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তাদের একজনকে কিংবা উভয়কে প্রত্যাহার করা হত^{২৫}।

কেন্দ্রীয় দিওয়ান যেমন সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন, তেমনি প্রাদেশিক দিওয়ান ছিলেন প্রদেশের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান। বাজেট অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের বার্ষিক আগাম হিসাব প্রস্তুতকল্পে এবং রাজস্ব নির্ধারণ, আরোপ ও আদায় করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় দিওয়ানের অধীনেও অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিল। মিরাত-ই-আহমদীর বর্ণনানুযায়ী^{২৬} কেন্দ্রীয় ওয়াজিরাত দপ্তরের ৬টি^{২৭} গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কাজ কর্ম প্রদেশে প্রাদেশিক দিওয়ান সম্পাদন করতেন। তিনি কোষাগারের অর্থ বৃদ্ধির জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

প্রাদেশিক দিওয়ান কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য আশ্রয় চেষ্টা করতেন এবং যাতে কেহ তাঁর অনুমতিপত্র ব্যতীত কোষাগার হতে কোন অর্থ গ্রহণ, নিষিদ্ধ শুল্ক বা কর আদায় করতে না পারে প্রভৃতি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আমিলদের হিসাব-নিকাশ তিনি কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন এবং দুর্নীতিপরায়ণ আমিলদের পদচ্যুতির জন্য কেন্দ্রে অভিযোগ পেশ করতেন। আমিলদের অবহেলার কারণে যদি কোন অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দেখা দিত তাহলে আদায়কৃত বকেয়া দেয় রাজস্বের পাঁচ শতাংশ হিসাবে সহজ কিস্তিতে প্রতি বছর আদায় করার বন্দোবস্ত দিওয়ানকেই করতে হত। তিনি তাকাভি খণ আদায়^{২৮} ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের জন্য বরাদ্দ অর্থের খরচের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন। প্রদেশের যাবতীয় সরকারি কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ ও দিওয়ানের দায়িত্বাধীন ছিল। প্রশাসনিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য কাগজপত্র, সুবার সদর দপ্তরের কাগজপত্র, সকল সরকারি কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিপত্র, জায়গীর প্রদান সংক্রান্ত দলিলপত্র, রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয়ের বিবরণী খাদ্য সামগ্রীর মূল্য তালিকা ইত্যাদি দিওয়ানের দপ্তরে সংরক্ষিত থাকত^{২৯}।

দিওয়ানের সচিবালয়ে নিম্নলিখিত প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়োজিত ছিলেন^{৩০} :

ক. পেশকার বা সচিব

খ. ব্যক্তিগত সহকারী

গ. একান্ত সহকারি

ঘ. দারোগা বা সুপারিনটেনডেন্ট

ঙ. মুশরিফ বা প্রধান সহকারী বা প্রধান হিসাব রক্ষক

চ. তহশিলদার -ই- দপ্তরখানা বা খাজাঞ্চি

ছ. হুজুর নবীস বা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে পত্র বিনিময়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেরানী

জ. সুবা-নবীস বা গভর্নরের দপ্তরের সাথে পত্র বিনিময়ের ভারপ্রাপ্ত কেরানী

ঝ. ওজন ও মাপের হিসাব রাখার কেরানী

ঞ. মূল্য বিবরণী সংরক্ষক

ট. সংবাদদাতা

ঠ. দপ্তর বন্দ

ড. কাছারীর পিয়ন ও প্রহরী।

গ. সদর: সুবাদার ও দিওয়ান ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সদর নিযুক্ত করা হত। কেন্দ্রের অনুরূপ অফিসারদের মত সদর স্বীয় দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতেন। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় তিনি ধর্ম বিষয়ক বিভাগের প্রধান ছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি প্রদেশের বিচার ব্যবস্থাও পরিচালনা করতেন। তবে মুঘল শাসনামলে প্রায়শই সদর ও কাজীর বিভাগ দু'টি সংযুক্ত ছিল। তারা উভয়ে ধর্মীয় দান খয়রাত এবং শিক্ষা ব্যবস্থারও তদারক করতেন।

ঘ. কাজী : প্রদেশের বিচার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন কাজী। তিনি প্রধান কাজী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রাদেশিক কাজী স্বীয় অধীনস্থ কাজীদের নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। প্রদেশের বিচার ব্যবস্থা ছাড়াও প্রয়োজনে তিনি ওয়াক্ফ সম্পত্তি ধর্মীয় বিষয়াবলী প্রভৃতি তত্ত্বাবধান এবং এতদসংক্রান্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করতেন। প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশে বেশ কিছু সংখ্যক আদালত ছিল। যেমন: প্রাথমিক ও আপীল বিভাগ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত যা আধুনিক মহকুমা হাকিম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও মুনসেফের আদালতের অনুরূপ।

ঙ. বখশী : প্রদেশে বখশী নামে একজন অফিসার নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় বখশীর তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন। বখশীর বহুবিধ দায়িত্বের মধ্যে নতুন সৈন্য সংগ্রহ ও নিয়োগ, সৈন্যবাহিনীকে সুশৃংখল অবস্থায় রাখা, সৈন্য সমাবেশ ও সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, মনসবদার ও সৈন্যদের বেতনের দাবিপত্র মঞ্জুর, সৈন্যবাহিনীর অশ্ব ও অন্যান্য যন্ত্র পরিদর্শন, অশ্বচিহ্নিতকরণ পদ্ধতি কার্যকর করা এবং যুদ্ধকালীন সময়ে সম্রাটকে সৈন্য সরবরাহ করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল।

চ. পোন্দার : প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশে পোন্দার নামে একজন অফিসার নিযুক্ত ছিল। পোন্দারের নানাবিধ কার্যের মধ্যে প্রধানতম কাজ ছিল কৃষকদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় এবং তা রাজস্ব রাজকোষে জমা দেয়া। এছাড়াও তিনি রাজস্ব আদায়ের কাগজপত্র এবং হিসাব সংরক্ষণ করতেন। কিন্তু তিনি দিওয়ানের অনুমোদন ছাড়া টাকা খরচ করতে পারতেন না।

ছ. কোতোয়াল : সুবা বা প্রদেশের পুলিশ বাহিনীর প্রধান ছিলেন কোতোয়াল। “কোট” ও ‘পাল’ হিন্দি শব্দদ্বয় হতে কোতোয়াল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হল দুর্গরক্ষক^{৩১}। তিনি বিভিন্ন শহরে ফাঁড়ি বসাতেন। অস্থারোহী ও পদাতিক বাহিনী তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োজিত থাকত। ভারতের প্রাচীন আমলের স্থানিক এবং পশ্চিম এশিয়ায় খিলাফতের প্রাথমিক যুগের মুহতাসিবের সম্মিলিত কর্তব্যাদি মুঘল আমলের কোতোয়ালরা পালন করতেন^{৩২}। মুঘল আমলে শহর-নগর ও শহরতলীর শান্তি-শৃংখলা রক্ষা এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের। শহরে নিয়মিত পাহারার বন্দোবস্ত, হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার বিহীন বিষয় সম্পত্তির তদারক, ও নিষ্পত্তিকরণ, অপরাধ, সামাজিক অপব্যবহার ও কু-প্রথা নিরোধকরণ ইত্যাদি কোতোয়ালের প্রধান কর্তব্যাদির অন্যতম ছিল। তিনি শহরের প্রত্যেক অঞ্চলের জনসংখ্যার তালিকা প্রণয়ন, নুতন আগমনকারী ও বহিরাগমনকারীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেয়া, দৈনন্দিন ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সরাইখানার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। বেকার লোকদের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা করাও তাঁর কর্তব্য ছিল। তাঁকে শিশু হত্যা ও বলপূর্বক সতীদাহ প্রথা রদ করা এবং পতিতালয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে হত।

কোতোয়াল প্রকৃত পক্ষে শহরের পুলিশ বাহিনীর প্রধানরূপে একজন পৌর কর্মকর্তা ছিলেন এবং জনগণের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা তাঁর প্রধান দায়িত্ব ছিল^{৩৩}। মিরাত-ই-আহমদীতে সম্রাট আকবরের ফরমান অনুযায়ী কোতোয়ালের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশাবলীর^{৩৪} উল্লেখ রয়েছে যেমন:

- ক) সহকারীদের সাহায্যে ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠার তালিকা প্রণয়ন;
- খ) বসবাসকারীদের পারস্পরিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা বিধান;
- গ) শহরকে মহল্লায় বিভক্ত করে প্রত্যেক মহল্লার জন্য একজন মহল্লা প্রধান ব্যক্তি নিযুক্ত এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা,
- ঘ) হাট-বাজারে দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ;
- ঙ) ধনী ব্যক্তিগণ যাতে একচেটিয়াভাবে বেশী দ্রব্য ক্রয় করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা; এবং
- চ) তাঁর নিজ এলাকায় মদ্যপান ও বিক্রয় বন্ধ করতে সচেষ্ট থাকা।

অবশ্য মনুচী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে কোতোয়ালের দায়িত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য^{৩৫} পরিবেশন করেছেন। যথা:

- ক) মদ-সুরা বন্ধের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
- খ) শহরে কোন ব্যাভিচার, বেশ্যাবৃত্তি^{৩৬} না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা।
- গ) চোর-দস্যু ও অপরাধীদেরকে শ্রেষ্টতার করা,
- ঘ) কাজীর অধীনস্তরূপে কাজীর হুকুম পালন প্রভৃতি।

জ) ওয়াকিয়া নবিস : মুঘল যুগের প্রাদেশিক শাসন কাঠামোতে ওয়াকিয়া-নবিস ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। ওয়াকিয়া-নবিস ছিলেন প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান এর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা। ওয়াকিয়া-নবিসকে কখনও কখনও ওয়াকিয়া নিগারও বলা হত। ওয়াকিয়া-নবিস ও সাওয়ানিহ-নিগার একই ধরনের অর্থাৎ লেখক বা ঘটনাবলীর পরিদর্শনকারী বুঝায়। তবে তাদের দু'জনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ওয়াকিয়া নবিস ছিলেন নিয়মিতভাবে অধিকহারে গণ সংবাদদাতা, কিন্তু সাওয়ানিহ-নিগার ছিলেন শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিষয়ে গুপ্তসংবাদদাতা। সাওয়ানিহ-নিগার গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করত এবং ওয়াকিয়া নবিসের কাজের উপরও দৃষ্টি রাখতেন^{৩৭}। মূলতঃ প্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণী পেশ করার জন্য ওয়াকিয়া-নবিসদিগকে নিযুক্ত করা হত; কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে তাদের দ্বারা ঘটনা চেপে রাখার সম্ভাবনা থাকার দরুন সাওয়ানিহ-নিগারদেরকে (যাদেরকে কুদিয়াহ-নবিসও বলা হত) গোপনে সংবাদ সংগ্রহকল্পে সুবার বিভিন্ন অঞ্চলে গোয়েন্দারূপে নিয়োগ করা হত। বস্তুতপক্ষে তারা ছিল অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদদাতাদের শ্রেণীভুক্ত^{৩৮}।

ছোট ছোট পরগনার ঘটনাবলীর বিবরণ প্রেরণ করার জন্য ওয়াকিয়া-নবিস তাঁর অধীনে বিভিন্ন পরগণায় প্রতিনিধি নিয়োগ করত। প্রাদেশিক ভাইসরয়ের প্রকাশ্য দরবার অনুষ্ঠিত হলে, ওয়াকিয়া-নবিস দরবারে উপস্থিত থেকে দরবারের কার্যাবলীর দ্বারা বিবরণী তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করতেন। কিন্তু সাওয়ানিহ-নিগার এরূপ কাজ করতে পারত না^{৩৯}। যদুনাথ সরকারের এক বর্ণনানুযায়ী ওয়াকিয়া-নবিস প্রতি সপ্তাহে একবার ঘটনাবলীর প্রতিবেদন প্রেরণ করলেও সাওয়ানিহ-নিগার প্রতিমাসে আটবার গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করত^{৪০}। স্থানীয় জনসাধারণ এই গোপন সংবাদ প্রেরকদেরকে ভীষণ ভয় করত।

ওয়াকিয়া-নবিস প্রাদেশিক সরকারের সদর দপ্তর ও প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে অধীনস্থ সংবাদদাতাদের মাধ্যমে ঘটনাবলীর বিবরণী এবং শহরের বিবরণীসহ তা কেন্দ্রে সম্রাটের দরবারে অর্থাৎ দারোগা-ই-ডাক বা ডাক বিভাগের প্রধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠাতেন। ডাক বিভাগের প্রধানকে প্রদেশের ডাক প্রেরনের কাজ কর্ম তদারক করা ব্যতীত প্রদেশের গুপ্তসংবাদ প্রেরণ সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা অর্থাৎ গোয়েন্দা প্রধানরূপে কাজ করতে হত। তার কর্মচারী ছিল প্রধানত গুপ্তচর বেশে সংবাদদাতা। এ ছাড়া স্থানীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণের জন্য হরকরা পদ্ধতিও প্রবর্তিত ছিল।

ঝ. মুতাসাদদি : মুঘল সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের মাধ্যমে আমদানী-রপ্তানী, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হত। এরকম গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। মুঘল আমলে সুরাট বন্দর ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর। বন্দরের প্রধান কর্মকর্তা 'মুতাসাদদি' নামে পরিচিত ছিল এবং তিনি বন্দরের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলেন। বন্দরের গভর্নর

মুতাসাদদি পদমর্যদায় প্রাদেশিক গভর্নরের সমতুল্য ছিলেন। যদি একজন গভর্নর একাধিক বন্দরের দায়িত্বে নিয়োজিত হতেন তাহলে তিনি প্রতিটি বন্দরের জন্য একজন দারগা নিযুক্ত করতেন।

বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সদর দপ্তর দ্বারা নিয়োজিত হতেন। বন্দরের শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নাম নিম্নে^{৪১} প্রদত্ত হল:

- ক. সদর ও কাজী
- খ. বখশী ও ওয়াকিয়া-নবিস
- গ. সওয়ানিহ-নবিস
- ঘ. হরকরাহ
- ঙ. মুহতাসিব
- চ. আরব ও ইরাকী অশ্ব ক্রয় করার দপ্তরের এবং গবাদি পশুর ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারের দারোগা
- ছ. দপ্তর ও কোষাগারের দারোগা (তদারকি)
- জ. খরচ-পত্রাদির আমিন (নিয়ন্ত্রণকারী)
- ঝ. আদালত, পূর্ত বিভাগের দারোগা
- ঞ. শুদ্ধ-কর বিভাগের দারোগা
- ট. দান-দক্ষিণা, রক্ষনশালা ও দারিদ্রের জন্য ত্রাণ বিভাগের তদারককারী
- ঠ. ভাড়া ও কর আদায়ের দারোগা
- ড. হাসপাতালের তদারককারী
- ঢ. শস্যের বাজারের দারোগা
- ণ. লঙ্গর খানার খরচ পত্রাদির নিয়ন্ত্রণকারী;
- ত. মক্কা-মদীনা ও অন্যান্য পবিত্র তীর্থস্থানের জন্য বার্ষিক উপহার প্রেরণের দারোগা।

বন্দরের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক ব্যক্তির মালপত্র কঠোরভাবে তল্লাশী করতেন। কেননা ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান পাথর, মনি-মুক্তা চোরাচালানের জন্য নানাবিধ ছলচাতুরী, কলাকৌশল ও অসং উপায় অবলম্বন করত। মুঘল আমলে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিশেষ করে গভর্নর ও তাঁর মন্ত্রীদেব কার্যকলাপ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুঘল সম্রাটদেরকে বিভিন্ন কৌশল এবং নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

ক. গভর্নরদেরকে সাধারণতঃ তাঁদের মন্ত্রীবর্গসহ প্রায়ই এক প্রদেশ হতে অন্য প্রদেশে বদলী করা হত। এভাবে বারবার বদলীর কারণে গভর্নরদের পক্ষে কোন প্রদেশে স্থায়ী ক্ষমতা দৃঢ়করণ করা সম্ভবপর ছিল না।

খ. গুপ্তচর বাহিনী আখবার-নবীস, গোপনে সংবাদ প্রেরণ সংস্থা, গোয়েন্দা বিভাগ ছিল অত্যধিক শক্তিশালী। তাকে প্রদেশের কর্মকর্তা ও সাধারণ কর্মচারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সর্বদা সতর্ক রাখত।

গ. প্রদেশে দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন দিওয়ান ছিল সুবাদারের উপর এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তাছাড়া গোপনীয় সংবাদদাতা যেমন, সাওয়ানিহ-নবীস, হরকরাহ প্রভৃতির ভয়ে গভর্নর উদ্ধত ও সৈরাচারী হতে সাহস পেত না।

ঘ. সম্রাটের মাঝে মধ্যে প্রদেশসমূহ পরিদর্শন এবং কৃষকদের কল্যাণ সাধনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ, অত্যাচার-অনাচারের উপর প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতেন। ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটের প্রদেশসমূহ পরিদর্শন ব্যতীত রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণকে মাঝে মধ্যে প্রদেশ পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হত এবং ভ্রমণ হতে প্রত্যাগমনের পর তাদেরকে সম্রাটের নিকট পরিদর্শিত প্রদেশসমূহের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে হত। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের ফলে মুঘল শাসনামলে অনেকাংশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করত।

মুঘল শাসনামলে প্রতিটি প্রদেশ কতকগুলি সরকারে এবং প্রতিটি সরকার আবার কতকগুলি পরগনা বা মহালে বিভক্ত ছিল। উল্লেখ্য যে, পরগনা ছিল নিম্নতম সরকারি প্রশাসনিক ইউনিট। সরকারের শাসন ব্যবস্থায় হজুর অর্থাৎ প্রশাসনিক প্রধান ও মল অর্থাৎ রাজস্ব প্রধান ছিলেন যথাক্রমে ফৌজদার ও আমলগুজার। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, শের শাহের আমলের শিকদার-ই-শিকদারান ও মুনসিফ-ই-মুনসিফানের পরিবর্তে সম্রাট আকবর ফৌজদার ও আমলগুজার শব্দ ব্যবহার করেন, যদিও প্রশাসনিক দিক দিয়ে তাদের ক্ষমতার অধিক্ষেত্র ও দায়িত্বের কোন পরিবর্তন করা হয়নি^{৪২}। তবে আইন-ই-আকবরীতে আইন-ই-ফৌজদার এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ফৌজদারকে মূলতঃ ত্রিবিধ দায়িত্ব পালন করতে হত। যথা রাজস্ব, পুলিশ, ও সামরিক বাহিনী। রাজস্ব প্রশাসনে ফৌজদারের দায়িত্ব ছিল পরোক্ষ। তবে সরকারের অন্তর্গত গ্রাম্য অঞ্চল ও সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান ছিল তাঁর প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্থানীয় সেনাবাহিনী সুসজ্জিত করা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নিয়মিত পরিদর্শন করাও ছিল তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। ফৌজদার ও আমলগুজার ব্যতীত বিচার ও ধর্ম বিষয় সংক্রান্ত দণ্ডের দায়িত্বে সরকার শাসন ব্যবস্থায় আরও দু'জন কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন। তাদের পদবি ছিল কাজী ও কোতোয়াল। কাজী দেওয়ানী বিচারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন; কোতোয়াল ছিল পুলিশ বাহিনীর প্রধান এবং প্রদেশের নিরাপত্তা বিধান তার দায়িত্ব ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ফৌজদারের বিচার করার ক্ষমতা ছিল না। ফৌজদার কেবল মাত্র গভর্নরের প্রতিনিধিরূপে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং কাজী বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন। সুতরাং এর থেকে প্রতীয়মান হয়

যে, সরকারের শাসন ব্যবস্থায় ফৌজদার, আমলগুজার, কোতোয়াল ও কাজী এই চারজন প্রধান কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন।

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় শিকদার ছিলেন পরগণার প্রধান। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে তিনি পুলিশ ও ফৌজদারী বিচারের দায়িত্বও পালন করতেন। কখনোও কখনোও পরগণার শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফৌজদার ও কোতোয়ালের দায়িত্বাবলীও শিকদারের উপর ন্যস্ত করা হত। সাধারণভাবে পরগণার সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য শিকদার ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি^{৪৩}। শিকদার, জায়গীরদার ও দারোগা পরগণার অন্তর্গত শহরে সমাজ বিরোধী ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকদের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন^{৪৪}। পরগণার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে আমিল প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে অভিহিত ছিলেন। তাঁকে সরাসরি কৃষকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের কাজ সম্পন্ন করতে হত। উক্ত প্রধান দায়িত্ব ব্যতীত গ্রাম প্রধানদের সাথে একত্র হয়ে পরগণার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দুরাচার লোকদের শাস্তি প্রদানের কাজে শিকদারকে আমিল সহযোগিতা করতেন। একইভাবে অব্যাহত কৃষকদের নিকট হতে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে আমিলকে শিকদারও সাহায্য করত।

পরগণায় আমিলের সাহায্যকারী হিসেবে আরও কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এদের মধ্যে আমীন, কারকুন, খাজাঞ্চী ও কানুনগো উল্লেখযোগ্য। আমিলের দায়িত্ব ছিল প্রজাদের রাজস্ব নির্ধারণ। এক্ষেত্রে তিনি সরেজমিনে প্রজাদের জমির অবস্থান ও ধরন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতেন। আমীন মুনসেফ নামেও পরিচিত ছিলেন। কারকুন ছিলেন পরগণার রেজিষ্ট্রার বা লেখক। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত আইন কানুন, বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতির কাগজপত্র এবং রাজস্বের হিসাব-নিকাশের জন্য দায়ী ছিলেন^{৪৫}। প্রত্যেক পরগণার একজন খাজাঞ্চী নিয়োগ করা হত। তিনি প্রজাদের ও জমিদারের নিকট হতে খাজনা গ্রহণ করে তার হিসাব ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। খাজাঞ্চী খাজনাদার এবং ফোতাহদার নামেও অভিহিত হতেন। পরগণার স্থানীয় প্রধানদের মধ্য হতে একজন কানুনগো নিয়োগ করা হত। তিনি স্থানীয় রাজস্ব প্রথা ও রীতিনীতির বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। এজন্য তাকে কানুনগো অর্থাৎ আইনের প্রবক্তা বলা হত। বস্তুতঃ রাজস্ব রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন একটি জ্বলন্ত অভিধান^{৪৬}। তা ছাড়া পরগণায় কয়েকজন চৌধুরী ছিলেন। চৌধুরী আধা সরকারি ও আধা-বেসরকারি কর্মচারী ছিলেন। তিনি প্রজাদের অভাব অভিযোগ ও সুযোগ সুবিধার বিষয়ে সরকারের নিকট প্রতিনিধিত্ব করতেন। গ্রামের রাজস্ব আদায় ও শান্তি রক্ষার ভার ছিল মুকাদ্দাম বা গ্রামপ্রধান ব্যক্তির উপর। সাধারণভাবে পাটোয়ারী ছিল গ্রামে হিসাব রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত মুকাদ্দাম বা পাটোয়ারী আদায়কৃত রাজস্ব পরগণার আমিলের নিকট জমা দিতেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁরা আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ পারিশ্রমিক পেতেন^{৪৭}।

গ্রামীণ প্রশাসন : ইতোমধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুঘল আমল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুঘল শাসকগণ প্রশাসন ব্যবস্থাকে গতিশীল রেখে জনগণের

কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম একক ছিল মৌজা বা গ্রাম। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, মুঘল সাম্রাজ্যকে কতকগুলি প্রদেশ বা সুবায় বিভক্ত করা হয়। সুবাগুলি আবার সরকার, ও প্রতিটি সরকার মহাল, পরগনা বা জেলায় বিভক্ত ছিল। পরগণার নিম্নে ছিল গ্রাম্য পঞ্চগয়েত। পঞ্চগয়েত ছিল জনপ্রিয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত। প্রধানতঃ যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা, প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশ, রাজকর্মচারীর সংখ্যার অপ্রতুলতা ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল। এতদসত্ত্বেও মুঘল শাসনামলে সাধারণভাবে গ্রামীণ প্রশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হতো না। এবিষয়ে জনৈক ব্রিটিশ পণ্ডিতের মতে “The Mohamedan rulers left the village communities intact.”^{৪৮}

গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তা বিধান, জমিদারের রাজস্ব সংগ্রাহকদের অবৈধ কার্যাবলী প্রতিরোধ করা এবং সমাজ বিরোধীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা। মুঘল শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে মুঘল শাসকগণ পল্লীবাসীদের এ সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে অবহিত ছিলেন। মুঘল আমলে গ্রামীণ শাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অগ্রগতি সাধিত না হলেও অতীত যুগ হতে গ্রামে যে একটা নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মুঘল প্রশাসকেরা সে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা হস্তক্ষেপ করেনি। মুঘল আমলে গ্রামীণ প্রশাসন ব্যবস্থায়, গ্রাম্য স্থানীয় শাসনপদ্ধতি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। গ্রামবাসীরা তাদের স্বীয় মনোনীত গ্রাম্য প্রধানের মাধ্যমে স্থানীয় রীতিনীতি, দেশাচার ও প্রথানুযায়ী তাদের নিজেদের বিষয়াদী মীমাংসা করত। এই গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো^{৪৯}। মুঘল গ্রামীণ প্রশাসন ব্যবস্থায় দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ গ্রাম্য পরিষদ ছিল গ্রাম প্রশাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনকাল থেকে এ গ্রাম্য পরিষদ পঞ্চগয়েত নামে পরিচিত ছিল। মূলতঃ এ ব্যবস্থা ছিল স্থানীয় সরকার ৫০ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিক। মুঘল কেন্দ্রীয় সরকার অহেতুক গ্রামীণ প্রশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করে ভারতের পুরাতন ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদর্শন করেছে^{৫১}।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামের প্রভাবশালী শ্রেণীর শাসন সংশ্লিষ্ট আচরণ প্রণালী। গ্রামীণ প্রশাসনে স্থানীয় প্রভাবশালী শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এ প্রসঙ্গে ‘W.W. Hunter এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য -

“The institution of village headswas in existence long previous to British rule, and it is a general belief that in the time of the Muhamedan administration of the country, these officer were appointed by the government direct. In those days, from all accounts these headmen had considerable power and influence, and were, to a very great extent, independent of the landlords (Zamindars). They were allowed to dispose

of petty cases themselves. Village disputes were in the first importance brought before them, and only those which they failed to settle were sent up for decision to a higher authority. ৫২

ভারতে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে একটি করে পরিষদ ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের গঠন সম্পর্কে বলা যায় যে, গ্রামে গ্রামে পৃথক পৃথক সামাজিক শ্রেণী, বর্ণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চায়েত ছিল। আবার গ্রামের অধিবাসীদের সকলকে নিয়ে সমগ্র গ্রামের জন্যও একটি গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠিত হত। সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বয়স, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত গুণাবলী গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হত। নির্বাচন ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। যোগ্য বিবেচিত হলে মহিলারাও নির্বাচিত হতে পারত^{৫৩}। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের প্রত্যেক গোত্রের বয়োবৃদ্ধরা গোত্র প্রধান ও সদস্য নির্বাচিত হত। অনুরূপ পদ্ধতিতে ভারতেও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্য মনোনীত হবার রীতি প্রচলিত ছিল। এ পদ্ধতিতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনয়ন লাভ করত। স্যার হার্বার্ট রিচলি গ্রাম্য পঞ্চায়েতের এ নির্বাচন পদ্ধতির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে পঞ্চায়েত নির্বাচন পদ্ধতিকে ইউরোপের রাজনীতির বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দ সমষ্টির তালিকাভুক্ত নির্বাচনের সাথে তুলনা করা উচিত হবে না^{৫৪}। প্রচলিত নিয়ম ছিল যে গ্রামবাসী একত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হত^{৫৫}। বস্তুত এই পদ্ধতিতে প্রস্তাবের পক্ষে উচ্চস্বরে আগ্রহের সাথে সম্মতিদানের মাধ্যমে নির্বাচন করা হত। উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই প্রাচীন গ্রীক ও জার্মান জনপ্রিয় সংসদ নির্বাচিত হত এবং ইহাই পৃথিবীর অতি প্রাচীন নির্বাচন পদ্ধতি। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কর্মপ্রণালীতে লক্ষ্য করা যায় যে, বিশেষ জরুরী বিষয়ের মীমাংসার জন্য সমগ্র সম্প্রদায়ের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হত। এছাড়াও কয়েকটি উপকমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত পরিষদ পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদন করত। নিম্নলিখিত উপকমিটির^{৫৬} নাম উল্লেখ করা যায়:

- ক. বার্ষিক কমিটি
- খ. বাগান কমিটি
- গ. পুষ্করিনী কমিটি
- ঘ. স্বর্ণ কমিটি
- ঙ. বিচার কমিটি।

(জ) মাথহাই গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মচারীদের কর্তব্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রাম্য প্রধান গ্রামের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, আইন শৃংখলা, রক্ষাসহ সর্ববিষয়ে তদারক করতেন এবং তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা গ্রামের রাজস্ব আদায় করত। হিসাব রক্ষক চাষাবাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখত। পাহারাদাররা গ্রামের নিরাপত্তা বিধানের জন্য চোর, ডাকাতির উপদ্রব রহিতকরণ এবং

নানা প্রকার অপরাধজনিত কার্যকলাপ রদ করার জন্য সর্বপ্রকার পাহারার ব্যবস্থা করত সীমানা রক্ষণকারী গ্রামের সীমা রক্ষা এবং সীমানা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদের সাক্ষ্য প্রমাণ দিত। পুরোহিত গ্রামের পূজা অর্চনা ও ধর্ম বিষয়াদি দেকভাল করতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। এতদ্ব্যতীত পুকুর তদারককারী, চিকিৎসক, জ্যোতিষী, গণক, ধাতুশিল্পী, ছুতার, মিস্ত্রী, নাপিত, ধোপা, কুম্ভকার ইত্যাদি গ্রামের নানা কাজে লিপ্ত ছিল।

গ্রাম্য পঞ্চায়েত দেওয়ানী, ফৌজদারী, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল প্রকারের বিবাদ সংঘর্ষ মীমাংসা করত। ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, নিরাপত্তা বিধানের জন্য পাহাড়ার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য কর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, পূর্তকার্য, দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, উৎসবাদি উদযাপন প্রভৃতি ছিল পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন গ্রাম্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ গ্রাম্য প্রধানের মধ্যস্থতা ও সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হত, গ্রাম্য প্রধান স্বয়ং ছোট ছোট বিবাদ মীমাংসা করতেন। কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বয়োবৃদ্ধদের সমন্বয়ে গঠিত সংসদদের সাহায্যে বিবেচনা করে নিষ্পত্তি করা হত। মুঘল শাসকদের সতর্ক দৃষ্টির ফলে গ্রাম্য প্রধানগণ তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ পেতেন না এবং তাঁরা সংযমী হতে বাধ্য হতেন^{৭৭}। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রধান সকল ধরনের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করলেও যদি বাদী-বিবাদীর কোন এক পক্ষ পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হত, তাহলে ক্ষুব্ধ পক্ষ সরকারি বিচারালয়ের নিম্ন পর্যায় হতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত আপীল অর্থাৎ পুনর্বিচারের জন্য প্রার্থনা করার সুযোগ ছিল। অভিযোগের সত্যতা উদ্ধার ও বিচারের নির্ভুল রায় প্রদান করা সরকারি আদালত অপেক্ষা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক ও সহজ ছিল। কারণ গ্রামের একই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদেরকে পঞ্চায়েতের পক্ষে যতটা গভীর ও সঠিকভাবে জানা সম্ভব, বিচারালয়ের বিচারকের পক্ষে তা সম্ভব নয়^{৭৮}। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিচারের সর্বাপেক্ষা সুবিধা হল গ্রামবাসীকে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য কোন ফি দিতে হত না। অধিকন্তু সরকারি অফিস-আদালতে মামলা মোকদ্দমার বিচার করতে গিয়ে গ্রামীণ জনসাধারণকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হত। তাছাড়া কখনও কখনও হয়রানিও হত। গ্রাম্য পঞ্চায়েত বিচার ব্যবস্থায় তার অবসান ঘটে^{৭৯}।

গ্রামীণ প্রশাসনে পঞ্চায়েত সভা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। গ্রামের এমন কোন বিষয় ছিল না যা গ্রাম পঞ্চায়েতে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পঞ্চায়েত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে মেনে নিতে হত। ব্যবস্থা যতই কঠোর হোক না কেন পঞ্চায়েতের বিধান অমান্য করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। পঞ্চায়েত সভায় উপস্থাপিত বিষয়াবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হত যাতে কেউই অন্যায় অবিচারের শিকার না হয়। জমিদার এবং উর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারীরা পঞ্চায়েত সভার আওতার বহির্ভূত ছিলেন।

মুঘল আমলের গ্রামীণ প্রশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ইংরেজ প্রশাসনের সূচনায় ধীরে ধীরে

বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মুঘল যুগের গ্রামীণ প্রশাসনের পতনের কয়েকটি কারণ লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ ইংরেজ সরকারের গ্রামীণ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। দ্বিতীয়তঃ মুঘল শাসনের শেষ পর্যায়ে জমিদারের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি গ্রামীণ শাসনপদ্ধতির পক্ষে হুমকির সৃষ্টি করে। W. W. Hunter যথার্থই মন্তব্য করেছেন, One of the chief reasons for this change is the increasing influence and the more centralized power of the Zamindar.^{৬০}

জনগণের উপর অবাধ শোষণ চালাবার জন্য মুঘল শাসনের শেষ পর্যায়ে জমিদারেরা কানুনগো, আমিল, পাটোয়ারী, মন্ডল, চোখুরী প্রমুখ কর্মচারীদের নিজেদের কর্তৃত্বাধীন আনয়ন করতে সমর্থ হয়। জমিদারদের দ্বারা প্রতিপালিত সেনা ও লাঠিয়াল বাহিনী প্রভৃতির ভয়ে গ্রাম প্রধান, সরকারি কর্মচারী এবং জনসাধারণ সদা সন্ত্রস্ত থাকতো। কোম্পানী শাসনের সূচনায় পদস্থ সরকারি কর্মচারীরা জনগণের স্বার্থ ত্যাগ করে জমিদারদের পক্ষাবলম্বী হতে বাধ্য হয়। তৃতীয়তঃ ইংরেজ প্রশাসনের নিজস্ব পদ্ধতি প্রচলনের ফলে গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায়, মুঘল প্রাদেশিক শাসন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনুরূপ বলা যায়। মুঘল আমলে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় পরিচালিত হত। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হবার বিষয়টি মুঘল প্রাদেশিক শাসনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তবে স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসাবে স্থানীয় সরকার কর ধার্য করতে পারে। মুঘল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় তারা আয়ের উৎস এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আইনকানুন প্রণয়ন করে থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত। তেমনি স্থানীয় সরকার জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে কাজ করে এবং জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। উল্লেখ্য যে মুঘল শাসন মধ্যযুগে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশের আধুনিক পদ্ধতির স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোগত বিকাশ শুরু হয়েছে ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত হয়ে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে প্রণীত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বহু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে বর্তমানে জেলা পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার পরিষদ, থানা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। মুঘল কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছিল, ঠিক তদ্রূপ বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম পর্যন্ত সরকারি শাসনব্যবস্থা প্রসারিত। মুঘল প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি ও কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

গ্রাম পর্যন্ত সামাজিক গতিশীলতা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, জনপ্রতিনিধিত্বের গুরুত্বের অভাব, জাতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও সদ্যহারে অনীহা, সরকারের সদিচ্ছার অভাব প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করতে পারেনি। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে জাতীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে তার সঠিক ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত ও তাদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হলে সামগ্রিকভাবে উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

টীকা ও তথ্যপঞ্জি

১. আবুল ফজল : আইন-ই-আকবরী, প্রথম খণ্ড ব্লক ম্যান কর্তৃক অনূদিত;
কলিকাতা, ১৯৮৪ পৃঃ ৩৮৬
২. Jadunath Sarkar : Mughal Admisnistration, Calcutta, 1920, P. 55
৩. তরফ এর অর্থ গতি, দিক-Ibid, P, 56-57
৪. জিয়াউদ্দিন বারানী : তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, কলিকাতা, ১৮৯০, পৃঃ ৮২ ও ৯৬।
৫. শরণ, পরমাত্মা : The Provincial Government of the Mughal
Alahabad, 1922, পাদটীকা, পৃঃ ১৭০।
৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭০
৭. গোলাম হুসেন সলীম : রিয়াজ-উস-সালাতিল (মৌলভী আব্দুল হক কর্তৃক
সম্পাদিত ও আব্দুস সালাম কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত), কলিকাতা,
১৯১০, পৃঃ ১৭০.
৮. আবুল ফজল : আকবরনামা ৩য় খণ্ড, (হেনরী বেভারীজ কর্তৃক অনূদিত)
কলিকাতা, ১৮২১, পৃঃ ৭২২
৯. শরণ, পরমাত্মা : পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩
১০. আবুল ফজল : আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫১১
১১. ১৬০৮ খৃঃ ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি
পদমর্যাদার চিহ্ন গ্রহণের জন্য আগ্রায় এসেছিলেন।
১২. আলী মুহাম্মদ খান : মিরাত-ই-আহমদী পৃঃ ৩৮৯-৪০০
১৩. শরণ, পরমাত্মা : প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫
১৪. পূর্বোক্ত.
১৫. Jadunath Sarkar : Op. Cit., P. 185.
১৬. Jadunath Sarkar : Studies in Mughal India, Calcutta, 1991.
P. 215.
১৭. E.G. Brown : A Literary History of Persia, Cambridge,
1928, Vol- 1, P. 208.
১৮. Encyclopaedia of Islam, Vol.- 1, P. 179.

১৯. S.A. Q. Husaini : Mughal Administration, Lahore, 1957, P. 60.

২০. শরণ, পরমাত্মা : প্রাপ্ত, পৃঃ ১৮৯

২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৪

২২. পূর্বোক্ত।

২৩. Encyclopaedia Of Islam, Vol- 1, P. 13.

২৪. একে অন্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে উড়িষ্যার দিওয়ান মুহাম্মদ হাশিম (১৬৬১-৬৩) ও গভর্নর খান-ই- দওয়ার পারম্পরিক সম্পর্ক, J.N. Sarkar, Ibid, P. 221-224.

২৫. সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার দিওয়ান ওয়াজীর খানকে প্রত্যাবহাল করেছিলেন, কারণ বাংলার গভর্নর ওয়াজীর খানকে তিনি পছন্দ করতেন না। শরণ পরমাত্মা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা, পৃঃ ১৯৫।

২৬. আলী মুহাম্মদ খান : পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২

২৭. S. A. Q. Husaini : Ibid, P, 75

২৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।

২৯. শরণ, পরমাত্মা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১।

৩০. ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডুলিপি ৬৫৮৮, পৃঃ ৭২-৭৩।

৩১. কে.এন.পি. সাভা : শব্দকোষ, হিন্দি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪২।

৩২. শরণ, পরমাত্মা : পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৭-৯৮

৩৩. J. N. Sarkar : The Manuals of Officers Duties, p.67-71

৩৪. আলী মুহাম্মদ খান : পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭-৭৮।

৩৫. মানুচী : স্তোরিয়া দ্য মোগোর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০-২১।

৩৬. আঃ কাদের বদায়ুনী : মুনতাকাব-উত-তাওয়ারিখ, (রেনকিং হেইটা কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা, ১৯২৫), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২-০৩।

৩৭. J. N. Sarkar : Ibid, p. 71

৩৮. আলী মুহাম্মদ খান : পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭।

৩৯. J. N. Sarkar : Ibid, p. 73

৪০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩।

৪১. মুহাম্মদ কাজিম : আলমগীরনামা, ১০৮১।
৪২. শরণ, পরমাত্মা : পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৩-২১৪
৪৩. আব্বাস সারওয়ানী : তারিখ-ই-শেরশাহী, পৃঃ ১১৩।
৪৪. Iliot and Dowson : History of India, Vol-VI, P. 61
৪৫. Four Doctors : বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৯২, পৃঃ ৩৪৭।
৪৬. ঐ প্রাপ্ত।
৪৭. ঐ প্রাপ্ত, পৃঃ ৩৪৮।
৪৮. The Zamindari Settlement of Bengal, Calcutta, 1897, Vol-I, P. 37
৪৯. R.C. Majumdar, Corporate Life in ancient India, P. 588৯.
৫০. Ludlow : British India, It's Races and its History, Vol-I, P. 64-65.
৫১. Sir, John Molcolm : Mamories of Central India, Vol-II, P.3.
৫২. Hunter, W.W : A Statistical Account of Bengal, London, 1876, Vol-III, P.70, 71.
৫৩. Matthai, J : Village Government in British India, London, 1913, P.29
৫৪. S.A.Q. Husaini : Ibid, P. 234.
৫৫. Op. Cit., P. 236.
৫৬. Matthai, J : Ibid, P. 20-26.
৫৭. Ibid, P. 162
৫৮. V. A. Smith : Rambles and Recollections of Sir William Steeman, 1893, Vol-II, P. 34-35.
৫৯. S.A.Q. Husaini : Ibid, P. 235.
৬০. Hunter, W.W : Ibid, Vol. IX, P. 95.

লোক-প্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্নাল। প্রতি ইংরেজি বছরের মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক-প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধ অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

- প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্নাল বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।
- লেখা মানসম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পাণ্ডুলিপির সংগে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটারে কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবে : বাংলা কম্পোজ : “বিজয় সুতর্নি” এবং ইংরেজি কম্পোজ : “টাইমস নিউ রোমান” ফন্ট।
- প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।
- প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- মূল কপি সহ পাণ্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্ত (পরিছন্ন কপি) সম্পাদক বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভার পেজে) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।
- ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে যুক্ত করতে হবে। প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজিতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থস্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খণ্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা ইত্যাদি প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।
- লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকী’র ৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।
- প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।
- মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (২৫০ থেকে ৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।